কোথাও বা তিনি আমিন বা রাজস্ব সংগ্রাহক, কোথাও বা তিনি নিছক জমিদার, মিলকিয়াৎ-এর অধিকারী। আবার ১৭৪৫ সন পর্যন্ত তিনি যে মুঘল শাসনের অধীনে ছিলেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে; কারণ রাজস্ব অনাদায় হেতু মুঘল ফৌজদার তাকে বন্দী করেছে।

আলা সিংহের ক্ষমতা বিস্তৃতির ক্ষেত্রে 'রেখ ব্যবস্থা' কাজ করে। নিয়মিত অর্থের বিনিময়ে একটি এলাকাকে সামরিক প্রতিরক্ষার আওতায় এনে লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার আশ্রয় দেওয়া হত। এই খানাদারি ব্যবস্থার রূপান্তর করে আলা সিং আশ্রিত গ্রামগুলিকে নিজের সরাসরি শাসনের আওতায় আনতেন এবং তাদের থেকে টাকা সংগ্রহের বিনিময়ে নিজের তহশিলদার ও থানাদারদের নিযুক্ত করতেন। থানাদাররা তখন অন্য কোনো নতুন এলাকায় আলা সিংহের কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হত। আলা সিং অবশ্য তাঁর এলাকাতে পুরনো স্থানীয় ক্ষমতা গোষ্ঠীর সব ক্ষমতাকে স্বীকার করতেন এবং মুঘল প্রদত্ত অধিকারে কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। চৌথ ও সরদেশমুখির বিনিময়ে লুণ্ঠন থেকে অব্যাহতি ও ধীরে ধীরে মুলকগিরির এলাকাকে স্বরাজ্যে রূপান্তর, কামবিশদার বলে রাজস্ব কর্মচারির উদ্ভব— এ সবই অষ্টাদশ শতকে মারাঠা শক্তির ক্ষমতা বিস্তারের প্রক্রিয়ার নানা বিন্দু মাত্র। আলা সিংহের অভ্যুত্থানের পেছনেও আমরা একই প্রক্রিয়া দেখি।[১২৯]

এই জাতীয় শিখ ক্ষমতা স্থাপনের সঙ্গে বান্দার বিদ্রোহের প্রভাব অনেক। এখানে ধর্ম বা শোষিত সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ও সংগ্রামের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। জলন্ধর দোয়াবের শাসনকর্তা মুসলিম শাসক আদিনা বেগ খানের সুযোগসন্ধানী নীতির সঙ্গে শিখসর্দার আলা সিংহের নীতির কোনো পার্থক্য নেই। এখানে বিশুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক কায়েমি স্বার্থের আওতায় শিখ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। মিসলের সময় এই ধরনের সর্দারদের উদ্ভবই হল শিখ আন্দোলনের মূল দিক এবং বান্দার আমলের কৃষক-বিদ্রোহের চরিত্র ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হল। শিখ-বিদ্রোহ শুরু হয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠাকামী সম্প্রদায়ের নেতার মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোর কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায়ের আন্দোলন হিসেবে। এবং তা রূপান্তরিত হয় কৃষক-বিদ্রোহ ও সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামে। সেখান থেকে উঠে আসা সামন্ততান্ত্রিক সর্দারদের নেতৃত্বে পরিচালিত 'মিসল' ও দলগুলো। এভাবে বৃত্ত আবর্তিত হয়। কিন্তু এই আবর্তনের ফলে পাঞ্জাব থেকে নিশ্চিহ্ন হয় মুঘল রাষ্ট্রমহিমা ও আফগানশক্তি।

৩. কয়েকটি সাধারণ কথা: বর্ণ ও ধর্মের ভূমিকা

এখন আমরা কয়েকটি সাধারণ কথা বলতে পারি। অবশ্যই এইসব কথাগুলির ঐতিহাসিক যথার্থতা আরো গবেষণা সাপেক্ষ এবং ভবিষ্যতে নতুন তথ্যের ভিত্তিতে পরিবর্তন সাপেক্ষ। এখন এই কৃষক আন্দোলনে বর্ণ বা ধর্মের ভূমিকা কি তা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এ বিষয়ে প্রমাণ আছে যে, জাঠ-কৃষক আন্দোলনে 'খপ' বা জাতি পঞ্চায়েৎ বিভিন্ন সময়ে সমবেত হয়ে জাঠ-কৃষকদের মুঘল জায়গিরদারদের বিরুদ্ধে সমবেত হতে সাহায্য করে।[১৩০] শোভা সিংহের বিদ্রোহে বাগদি বা কোলিদের বিদ্রোহেও বর্ণের ভূমিকার আভাস পাওয়া যায়। একথা বোধহয় বলা যায় যে, জমিদাররা অনেক সময় বর্ণব্যবস্থার সংযোগে একই বর্ণভুক্ত রায়তদের সমর্থন প্রত্যাশা করতে পারতেন। গোটা মধ্যযুগ ধরে সামাজিক সম্পর্কের ওপর

Scanned with CamScanner

কর্তৃত্ব স্থাপন করে জাতে-ওঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন বর্ণব্যবস্থার কাঠামোই এরকম যে, এ ধরনের জাতে-ওঠা সম্ভব এবং তা সমাজকে খুব একটা বদলায় না। শুধু বর্ণব্যবস্থার পর্যায়ে কতকগুলি পরিবর্তন আসে। নতুন জাত সৃষ্টি হয়, বা কিছু জাত তার আগেকার অপেক্ষাকৃত নিম্নক্রমের বদলে আর একটু উঁচুক্রম পায়। ফলে মূল ভারসাম্য ঠিকই থাকে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠা কামনার আশা মধ্যযুগে অপেক্ষাকৃত বিরল ছিল। অন্যান্য ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বা ধর্মীয় আন্দোলনই তার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জাতিগত ঐক্য নিঃসন্দেহে এক ধরনের সংহতি এনে দিয়েছিল। বিশেষত যেহেতু গ্রামের বসতি স্থাপন এবং কৃষকদের অধিকার রক্ষার সঙ্গে বর্ণের সম্পর্ক ছিল এবং আইন-ই-আকবরী অনুসারে প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে জমিদারি অধিকারের বিস্তৃতির সঙ্গেই তাদের বর্ণের কথাও বলা হয়েছে— সেহেতু কৃষিজগতে বর্ণের সামাজিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। এবং নতুন গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার বা বিস্তৃতির লড়াইয়ের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা পাবার প্রশ্নও জড়িত। সুতরাং এইসব আন্দোলনে জয়লাভ মানে বর্ণব্যবস্থায় উচ্চক্রম লাভ করার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। আমরা দেখেছি, শিবাজী বা জাঠ সর্দার ঠাকুর বদনসিং এই সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

এবার বোধহয় আর একদিকে আঙুল দেখানো যায়। বর্ণের ভূমিকা সেখানেই এবং সেই সময়েই জোরদার— যেখানে ও যখন অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী শ্রেণী বা জমিদারদের ভূমির আন্দোলন প্রকট হয়েছে। কারণ, একেবারে তলার কৃষকদের পক্ষে হঠাৎ সামাজিক সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা শক্ত। তাদের লড়াই জীবনের ন্যূনতম মান বজায় রাখার জন্যে হয়েছে। সৎনামি, মাতিয়া বা বান্দার লড়াইতে অমরা বর্ণকে ব্যবহার করার পরিবর্তে বর্ণব্যবস্থায় জাত আইনগুলোকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখি। প্রকৃতপক্ষে বর্ণব্যবস্থাভিত্তিক আন্দোলন মধ্যযুগের কৃষক-আন্দোলনকে অনেকটা সমঝোতামূলক ও স্তিমিত করেছে। কারণ, প্রথমত— এ জাতীয় আন্দোলন স্বভাবতই অন্যান্য বর্ণের লোকদের যোগ দিতে বাধা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত— এইসব আন্দোলনের পক্ষে আপসমূলক হয়ে পড়বার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ, যে মুহূর্তে আন্দোলনের এক গোষ্ঠী জাতে-ওঠার কথা ভাবে, অমনি কায়েমি ব্যবস্থার মধ্যেই সে স্থান খোঁজে, উৎপাদন-ব্যবস্থা বা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের চেতনা সে আন্দোলনে আর থাকে না: গোটা আন্দোলন একান্ত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তাই, চুড়ামন জাঠ বা ছত্রশাল বুন্দেলা বিপুল আগ্রহে শিখ-বিদ্রোহ দমন করতে যায়। মারাঠা নেতা সদাশিব রাও ভাও ও আহমদশাহ আবদালির মধ্যে পাঞ্জাবের কৃষকরা কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। তাই, বর্ণ এক পর্যায়ে কৃষক-আন্দোলনে সংহতি আনে। কিন্তু আবার এই ব্যবস্থার জন্যে উচ্চতর একটি শোষকশ্রেণীর নেতৃত্ব আন্দোলনে তুলনামূলকভাবে অনেক তাড়াতাড়ি কায়েম হয়; আন্দোলনের আপসমুখী হবার সম্ভবনা অনেক বেশি থাকে এবং অন্য বর্ণ বা জাতিভুক্ত কৃষকদের সহানুভূতি ও সমর্থন তাই এ জাতীয় আন্দোলন পায় না।

Scanned with CamScanner

ক. কৃষক-বিদ্রোহে ধর্ম

ধর্মের ভূমিকা এখানে খানিকটা পৃথক। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা দরকার। আওরঙ্গজেবের গোঁড়া ধর্মান্ধ নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই আলোচিত বিদ্রোহগুলিকে সাধারণত দেখানো হয়ে থাকে। বিদ্রোহগুলির কারণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, এগুলির পেছনে গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের গোড়া থেকেই এই ধরনের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের সাক্ষ্যে বা দলিলেও ওইসব বিদ্রোহগুলির ধর্মীয় দিক ততটা গুরুত্ব পায়নি। সৎনামি বিদ্রোহকে হিন্দু নাগর ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদাস কিছু কম গালাগালি করেননি, বা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে দাসিরামের কৃষক-বিদ্রোহকে মুসলিম আওরঙ্গজেব কঠোর হাতে দমন করেছিলেন।

আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। প্রসঙ্গত এই কয়েকটি কথা আপাতত মনে রাখলে চলবে যে, প্রথমত— সারা ভারত জুড়ে বহু হিন্দু ধর্মমন্দির আওরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। দ্বিতীয়ত— আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সময় ৫০ বছর। এর মধ্যে অনেক নীতির বিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। একটি পর্যায়ের নীতিকে বিচার করে তাকে সারা রাজ্যকালের নীতি বলে স্থির করা অযৌক্তিক। তৃতীয়ত— আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত ধর্মমত এবং সম্রাট হিসেবে তাঁর ধর্মনীতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। চতুর্থত— আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যায় থেকে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির কঠোরতা কমে আসছিল এবং বাহাদুর শাহের সময় থেকেই সেগুলো একেবারে নাকচ হয়ে যায়। তাতে কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনের তীব্রতা কমে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, আওরঙ্গজেব ধর্মীয় অনুদার নীতি কখনো অনুসরণ করেননি, বা তা সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনোরকম বিদ্বেষের সঞ্চার করেনি। আসলে একটিমাত্র কারণকে দায়ী না করে অন্যান্য কারণ খোঁজা এবং বহু কারণের মধ্যে সম্পর্ক অনুযায়ী গুরুত্ব নিরূপণ করা একজন সৎ ইতিহাসজ্ঞের কাজ।

আবার, মধ্যযুগের বাতাবরণে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। চিন্তা ও চেতনার জগতে সাধারণ মানুষও ধর্মের নামেই চিন্তা করত, যদিও ধর্ম সম্পর্কে তার ধারণার সঙ্গে ধনীদের ধারণার পার্থক্য থাকতেই পারে। তাই, ধর্মের দুটো দিক আমরা সমাজে দেখতে পাই। একটি সরকারি ধর্মমত, যা সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায় এবং অপরটি প্রতিবাদী ধর্মমত। এখন ভারতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক থেকে সুফি ও ভক্তিবাদবিশিষ্ট ধর্ম প্রচারিত হয়। এইসব মরমিয়া ধর্মমতের সমর্থক ও অনুগতরা ছিল বিভিন্ন নিম্নজাতিভুক্ত কারিগর, খুদে ব্যাবসাদার ও কৃষক। ধর্মের বাহ্যিক আচার এবং সামাজিক বহু রীতিনীতির বিরুদ্ধে এইসব ধর্মগুলির প্রতিবাদ ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে এইসব প্রচারকেরা অবশ্য সরাসরি কোনো মত প্রকাশ করেননি, বরং দাদূ প্রমুখরা রাষ্ট্রক্ষমতার অপরিসীম শক্তিকে স্বীকারই করেছিলেন। কিন্তু এইসব ধর্মের মধ্যে নানা সামাজিক কারণে কোথাও কোথাও পরিবর্তন দেখা যায়। শিখধর্মের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। গুরুগোবিন্দ রাষ্ট্রক্ষমতার কাছে আবেদন-নিবেদনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করলেও প্রয়োজনমতো অস্ত্র নেওয়া যে যথার্থ, তা মুঘল সম্রাটকে জানিয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

"চুন্ কার আজ হমে হিলাৎ-ই দর গুজশ্ত।
হালাল আস্ত বুরদান বে শামসিরে দাস্ত॥"

(অর্থাৎ "অন্যান্য উপায় যখন ব্যর্থ হয় তখন হাতে তরবারি ধরা ন্যায়সংগত।")

সৎনামিরা এমনিতে নিরীহ হলেও কারো আজ্ঞাবহ ছিল না। তাদের ধর্মীয় নির্দেশেই এ ধরনের অনুজ্ঞা ছিল। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংস্কারমূলক ধর্ম রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারে। হবার সম্ভবনাও থাকে, কিন্তু হবেই তার কোনো মানে নেই। কোন সময় ও কোন অঞ্চলে সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়— তা বিশেষ সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেইসব আন্দোলনে ধর্ম কৃষকদের সংগ্রামে একটি বিশেষ চেতনা বা আদর্শের সঞ্চার করে। সৎনামি, মাতিয়া বা বান্দার নেতৃত্বে শিখ-বিদ্রোহে প্রতিরোধ আন্দোলনের যে তীব্রতা দেখা যায় বা বিদ্রোহী নেতাদের যে ধরনের জাদুবিদ্যার অধিকারী বলে মনে করা হত— তা যে-কোনো প্রতিবাদী ধর্মভিত্তিক কৃষক-আন্দোলনের লক্ষণ। এখানে কৃষকরা কোনো উচ্চতর গোষ্ঠীর জাতে-ওঠার উচ্চাশাকে রূপায়িত করার জন্যে বা নিজের বাঁচার তাগিদে শুধু লড়ছে না। তার সামনে একটি আদর্শের উন্মাদনা আছে, যে আদর্শ অস্ফুট বা আজকের চোখে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে অবাস্তব হতে পারে— কিন্তু সেটা অন্য কথা। ফলে সৎনামি, মাতিয়া বা বান্দার শিখ-বিদ্রোহে আত্মদান বা মরণপণ যুদ্ধের কাহিনী তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এইসব প্রতিবাদী ধর্মগুলিতে বর্ণের ভূমিকা কম, বা ধর্মগুলি বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ধর্মই এখানে সংহতি সাধন করে, বা ধর্মীয় সংগঠনগুলো আন্দোলনের পালটা সংগঠনের রূপ নিতে পারে। আবার, বর্ণব্যবস্থার প্রভাব শিথিল বলে নিম্নবর্ণের লোকেদের প্রাধান্য তুলনামূলকভাবে এখানে একটা পর্যায়ে স্থায়ী হয়।

আবার, এই ধর্মীয় চেতনার মধ্যেই কতকগুলো মূল্যবোধ জড়িয়ে থাকে। কৃষক-বিদ্রোহগুলো সেই মূল্যবোধকে স্বীকার করে। সামাজিক কারণে মুঘল আমলে ভারতীয় কৃষকের মূল্যবোধে মহাজন তার বন্ধু। ফলে, মহাজন-বিরোধী আন্দোলন আমরা মধ্যযুগে পাই না। পাপ রায় বা কিছু কিছু মারাঠা সর্দার নিন্দিত হন ও সামাজিকভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি হয়। কারণ তাঁরা ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যবসায়ীশ্রেণী বানজারাদের লুঠ করে, বা তাদের ওপর অত্যাচার করে। মনে রাখতে হবে যে, এরা যুদ্ধবিগ্রহের অঞ্চলে উভয় পক্ষের সৈন্যকেই ধান বিক্রি করত এবং মধ্যযুগের নিয়মানুযায়ী এদের ওপর আক্রমণ করা অনুচিত। সুতরাং বিদ্রোহের লক্ষ্য ইত্যাদি বিচারে কৃষকদের মানসিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের ভূমিকা অপরিসীম।

ধর্মীয় উৎসব বা সংগঠন সামাজিক সত্তারও বহিঃপ্রকাশ। আনন্দ, উন্মাদনা সব সমাজেই প্রয়োজনীয়, কৃষকসমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সেই সামাজিক সত্তায় হস্তক্ষেপ করে, সমাজের যোগাযোগের গ্রন্থিকে ব্যাহত করে। মুঘল রাষ্ট্রের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিক্ষোভগুলিকে এই পটভূমিতে দেখলে অনেক বেশি অর্থবহ হয়।

সবশেষে মনে রাখা দরকার যে ধর্মীয় আন্দোলনের উন্মাদনা সব সময়েই আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত— বান্দাও খালসা শিখদের হয়ে রামরাইয়া শিখদের ধ্বংস করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আবার, বান্দার আন্দোলনের উন্মাদনা মুসলিম নিম্নবর্ণের কয়েকটি জায়গায় শিখদের পক্ষে এনেছে, কিন্তু প্রতিপক্ষও কয়েকটি জায়গায় বান্দার আন্দোলনের

Scanned with CamScanner

ধর্মীয় দিককে ব্যবহার করে ধর্মের জিগির তুলে নিম্নবর্গের মুসলিমদের ইসলামের নামে সমবেত করতে পেরেছিল। সুলতানপুরে সামস খান 'বাফিন্দা' বা নিম্নবর্গের জোলাদের এককাট্টা করে শিখসৈন্যকে প্রতিরোধ করেছিলেন।[১৫১] এখানে ধর্মের নানাধরনের ভূমিকা কৃষকসমাজে থাকে। সংহতিও আনতে পারে, বিভেদও সৃষ্টি করতে পারে— আন্দোলন বা পরিস্থিতি অনুযায়ী তা নির্ধারিত হয়। সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা গেলেও বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সেই সাধারণ সত্য নাও খাটতে পারে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে সাধারণ নীতি আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতি ও সময়ের কথা ভুললে চলবে না।

এই কৃষক-বিদ্রোহের ও চেতনার একটি স্তরে ধর্মীয় বিদ্বেষ কিছুটা কাজ করেছে বা তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। সৎনামিরা কিছু মুসলিম মসজিদ ধ্বংস করেছে। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা ক্রমশ দেব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই মন্দির বা মসজিদ ধ্বংস করা ভারতীয় ইতিহাসে এই সময়ের কোনো বিশেষ ঘটনা নয়। আবহমান কাল থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা এরকম কাজ করে আসছে। আসলে এইজাতীয় ধর্মকেন্দ্রগুলি সেই বিশেষ ধর্মের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির কেন্দ্র। ফলে, বিরোধী ধর্মমতকে ঘিরে যখন একটা জঙ্গি গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন তারা প্রতিপক্ষের সামাজিক প্রতিপত্তির কেন্দ্রকে আক্রমণ করে। আবার, চেতনার ক্ষেত্রে অত্যাচার ও শোষণবিরোধী বলেই এই বিদ্রোহগুলি মূলত চিহ্নিত হয়। যেমন, বান্দার সম্পর্কে কথা প্রচলিত আছে যে, অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে রায়তরা বান্দার কাছে প্রতিকারের জন্যে আবেদন জানান। বান্দা তাদের ওপরেই গুলি চালনার আদেশ দেন এই বলে যে তারা কাপুরুষ, নিজেদের উদ্যোগে অত্যাচারী জমিদারকে শাস্তি দিচ্ছে না।[১৫২]

'সিয়ারে' একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। মহম্মদ আমিন খানের প্রশ্নের জবাবে মৃত্যুপথযাত্রী বান্দা বলেন, "মানুষ যখন এত অসৎ ও দুষ্ট হয়ে যায় যে তারা ন্যায়ের পথ ছেড়ে দেয় এবং সর্বপ্রকার অত্যাচার করে, তখনি ভাগ্যের আদেশে আমার মতো ভগবানের চাবুকের জন্ম হয় অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার জন্যে।" (মুন্‌তাখামে হকিকি দর মুকাফাতে আয়মলে আনহ চুন মন্ জালিমি র মিগুমার।)[১৫৩]

সিয়ার-এর রচনাকাল বান্দার বিদ্রোহের অনেক পরে। সমসাময়িক ইতিহাসজ্ঞ মহম্মদ শফি তেহেরানির রচনায় বা ইংরেজ দূত সুরমানের চিঠিপত্রে এই জাতীয় ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। উপরিউক্ত ঘটনা দুটি সম্ভবত ঐতিহাসিক তথ্য নয়। কিন্তু বান্দার বিদ্রোহ সম্পর্কে এই কল্পকাহিনীগুলি লৌকিক ধারণার পরিবাহী। সেখানে বান্দাকে সাধারণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিভূ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। কোনো ধর্মীয় বিদ্বেষের ছোঁয়া সেই লৌকিক চেতনায় কাজ করেনি। লৌকিক চেতনায় বান্দা নিছক ধর্মীয় নেতা নন, বরং প্রতিবাদী আন্দোলনের নায়ক।

আবার লক্ষণীয় যে, লৌকিক ধারণার বাইরে বান্দা নিন্দার পাত্র। গোঁড়া শিখদের কাছে বান্দার গণমুখী আন্দোলন বা ব্যবহার গৃহীত হয়নি। শিখ সাহিত্যের একটি ধারা অনুযায়ী বান্দা ভ্রাম্যমাণ যোগী ছিলেন বলে শিখদের সব আচরণ মানেননি। তিনি সুন্দরী নারী বিবাহ করেছিলেন। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠিত নায়কদের তিনি যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন না এবং গুরুগোবিন্দের স্ত্রীর কথা অমান্য করেছিলেন। তাঁর শোচনীয় মৃত্যু তাঁর ঔদ্ধত্যের শাস্তি মাত্র।

Scanned with CamScanner

আসলে বান্দার আন্দোলন সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। তাই শিখ ধর্মের রক্ষণশীল ঐতিহ্যে বান্দা অশ্রদ্ধেয় পুরুষ।[১৩৪]

আরো লক্ষণীয় যে, আন্দোলনের একটি পর্যায়ে বহু সময়েই এই জাতীয় ধর্মবিরোধ কোনো কাজ করে না— আন্দোলন চালাবার বা আন্দোলন দমনের খাতিরে পুরনো শত্রু আজকের মিত্র হয়। যেমন, আওরঙ্গজেবের আমলে যিনি সবচেয়ে বেশি মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন, তিনি হলেন রাজপুত সেনানায়ক ভীম সিংহ। তিনি একাই আহমেদাবাদের বিখ্যাত মসজিদ সমতে সাকুল্যে ৩০০টি মসজিদ ভাঙেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ভীম সিংহ আবার নিষ্ঠাভরে আওরঙ্গজেবের হয়ে মারাঠাদের দমন করতে যান এবং আওরঙ্গজেব তাঁকে বিনা আপত্তিতে ৩-৪ হাজার মনসব প্রদান করেন এবং সমতুল্য ওয়াতন জায়গিরও দেন। তাঁর মসজিদ ধ্বংসের কার্যকলাপকে আওরঙ্গজেব উপেক্ষা করেছিলেন, কারণ মারাঠা আন্দোলন দমন করা, ইসলাম ধর্ম প্রচারের চাইতে আওরঙ্গজেবের কাছে অনেক জরুরি ছিল।[১৩৫]

আবার, বান্দা সরহিন্দ শহরের মুসলিম মোল্লা ও বড়লোকদের সমূলে বিনষ্ট করলেও তার কর্তৃত্বাধীন এলাকায় মুসলিমরা নির্বিঘ্নে নমাজ পড়ত। মুখলিসপুরে প্রচুর মুসলিম সাধারণ লোক ছিল এবং সবাইকে চটানো বা শত্রু করা বান্দার পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়নি। আবার, আখবারাত-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী বান্দার সপক্ষে ৫ হাজার মুসলিম সৈন্য লড়াই করে।[১৩৬] সুতরাং ধর্মীয় উন্মাদনা বা বিদ্বেষের ভূমিকা কোনো সময় গ্রাহ্য করে নিয়েও আমরা একে বিশেষ পরিবেশজাত বলে বিচার করব। বহু সময়েই, কি লৌকিক চেতনায় বা কি বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে ধর্মীয় বিদ্বেষের ভূমিকা অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কাছে নগণ্য হয়ে গেছে। সৎনামিরা মসজিদ ধ্বংস করেও গোঁড়া ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদাস নাগরের ঘৃণার পাত্র ছিল, কারণ তাদের বিদ্রোহ ছিল মূলত সমাজের নিচুতলার লোকেদের সমর্থনপুষ্ট। তাই, ধর্মীয় বিদ্বেষের ভূমিকা কিছু থাকলেও তা নগণ্য। মূল ঝোঁকটা ছিল শ্রেণীচেতনা বা সংহতির ক্ষেত্রে।

ইসলাম ধর্মমতের আওতাতেও প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন এবং সশস্ত্র গণ-বিদ্রোহের মধ্যে গাঁটছড়া আমরা দেখতে পাই। রোশনিয়া আন্দোলন ও দাসি কুর্মির বিদ্রোহের কথা মনে করা যেতে পারে। এই দুটি আন্দোলনই পীরের উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত। দুটিতেই নিম্নবর্ণ ও উপজাতির অংশগ্রহণই বেশি। রোশনিয়া আন্দোলনের নায়করা শেষে মুঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন এবং এই আন্দোলনের বিশেষ কোনো অস্তিত্ব রইল না। ইসলাম ধর্মে এই জাতীয় পীর-কেন্দ্রিক মাহদি আন্দোলনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে এঙ্গেলসের কথা বোধহয় স্মর্তব্য। খ্রিস্টধর্মের প্রতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন যে, এই মাহদি আন্দোলনগুলো মূলত উপজাতি ভিত্তিক— যেখানে স্থায়ী ধর্মমতগুলোর ভিত্তি কৃষ্টিসম্পন্ন উন্নত শহরগুলো। এই উপজাতিগুলো তাদের দারিদ্র্যের সঙ্গে সমতা রেখে স্থায়ী ধর্মমতের বহিরঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাদের উৎপত্তিও হয় অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু তারা পুরনো ধর্মমতের অর্থনৈতিক শর্তগুলোকে অক্ষুণ্ণ রাখে; ফলে, কিছুদিনের মধ্যে উপজাতি ও প্রতিবাদী ধর্মমতের নায়করা জয় বা পরাজয়ের মাধ্যমে পুরনো কাঠামোর অংশীদার হয়। কিন্তু খ্রিস্টান মরমিয়া প্রতিবাদী ধর্মমতে পুরনো পিছিয়ে-পড়া অর্থনৈতিক কাঠামোকেও সংহতরূপে আঘাত

Scanned with CamScanner

করা হয় এবং তার ফলে নতুন এক সমাজের বার্তা পাওয়া যায়।[১০৭]

রোশনিয়া আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিতে এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। এর একটা কারণ বোধহয়, ঐতিহাসিক বিকাশের দিক থেকে উপজাতিরা কৃষিভিত্তিক নগরসভ্যতা থেকে পিছিয়ে-থাকা উৎপাদন ব্যবস্থার জগতে বাস করে। ফলে, সেই বস্তুভিত্তি থেকে প্রতিবাদ করলেও তাদের উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত কোনো-না-কোনো সময় থেকেই হয়। উপজাতিদের সঙ্গে বর্ণব্যবস্থা এবং কৃষি-সমাজের দ্বন্দ্ব এশিয়ার ইতিহাসে নতুন নয় এবং এই দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য ইসলামিক প্রতিবাদী ধর্মমতকে বিশেষ রূপ দিয়েছে। এই বিষয়ে বর্তমান পর্যায়ে জানা তথ্য সুপ্রচুর নয়। রোশনিয়া আন্দোলনের হঠাৎ অবসান ও আন্দোলনের নায়কদের পূর্ণভাবে আওয়ান মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোয় অংশগ্রহণের তথ্যই উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে মাত্র।

খ. কৃষক-বিদ্রোহে জাদুবিদ্যা

আরেকটি বিষয় এই ধর্মীয় উন্মাদনায় প্রভাবিত কৃষক-বিদ্রোহগুলিতে সময় সময় দেখা যায়। তা হলো জাদুবিদ্যার ভূমিকা। কি হিন্দু কি মুসলিম ধর্মে, লৌকিক ক্ষেত্রে এই জাদুবিদ্যা বা অতিলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এক স্বীকৃত সত্য। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে তথ্যের অভাব নেই। এমনকি প্রাচীন অথর্ববেদ এই জাদুবিদ্যার ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু ইসলাম ধর্মের লৌকিকতার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পাঞ্জাবের প্রসঙ্গে লিখিত মহম্মদ ঘাউসের 'জাওয়াহির-ই-খামসা' ও বাংলা দেশে 'শেক শুভোদয়া'র মতো পীর-সাহিত্যই এর যথেষ্ট প্রমাণ। কৃষিসমাজে নিয়ত প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কাছে বিশ্বাস ও দৈবশক্তির ওপর নির্ভর করে বর্তমান প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করার ভরসা তার চেতনার অঙ্গীভূত রূপ এবং তা বহু সময় তাকে শেষ আশার কথা শোনায়। এই জাতীয় চেতনা অবশ্যই এক ধরনের কুসংস্কার, কিন্তু যে কোনো সংস্কারের পেছনেও একটি সামাজিক পরিমণ্ডল কাজ করে, তাকে বোঝা দরকার।

এই ব্যাপক আলোচনার দিকে না গিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে, সশস্ত্র প্রতিরোধের ক্ষেত্রে জাদুবিদ্যার ধারণা বহু সময়ই দুই পক্ষকে আচ্ছন্ন করেছে। খুন্তাঘাটে সাফল্য অর্জনকারী কৃষক-সৈনাদের এক জাদুবিদ্যার অধিকারী বলে মির্জা নাথন মনে করেছেন। জালাল তব্রিজি ও অন্যান্য মুঘল কর্মচারিদের মৃত্যুর পেছনে জাদুবিদ্যা কাজ করেছে বলে বলা হয়েছে। মুঘল সৈনাদের সঙ্গে অনেক সময় মাতিয়ারা লড়াই করেছে এই ভেবে যে, মুঘল সৈন্যের অস্ত্র তাদের ধর্মগুরুর প্রভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সৎনামিদের মধ্যেও নাকি এরকম বিশ্বাস ছড়িয়েছিল যে, একজন জাদুকরীর প্রভাবে মুঘল অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং একজনের মৃত্যু হলে সেই জায়গায় আরো ৮০ জনের জন্ম হবে।

ঈশ্বরদাস নাগরের এই সাক্ষ্যকে খাফি খানও সমর্থন করেন। খাফি খান লিখেছেন, একথা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হত (আজ অনেকে শহরৎ তামাম ইয়াফতে) যে— সৎনামিদের উপর তরোয়াল, তীর বা গোলার কোনো প্রভাব নেই, অথচ তাদের অস্ত্রাঘাতে রাজকীয় সৈন্যের দুই-তিনজন মারা যাবে। জাদুঘোড়ার (অসপে জাদু) পিঠে উপবিষ্ট মহিলার কথাও ছড়িয়ে পড়েছিল। মুঘল সৈন্যবাহিনীও তাদের মোকাবিলা প্রথমে করতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত আলমগির 'জিন্দাপীর' নিজের হাতে সৈন্যবাহিনীর নিশানে পালটা তুকতাকের চিহ্ন লিখে